অভিমত

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর রুগ্নাবস্থা

নিখিল রঞ্জন দাস

আমাদের দেশে শিক্ষা বিস্তারে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর অবদান অনস্বীকার্য। এসব বিদ্যালয়ের মধ্যে সরকারি, মিশনারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বেসরকারি প্রভৃতি পর্যায়ের বিদ্যালয় রয়েছে। তন্মধ্যে খুব অল্পসংখ্যক বিদ্যালয় ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান যে আজ নিম্নমুখী তা বোধ হয় কারো পক্ষে অস্বীকার করার উপায় নেই। তথাপি শিক্ষা বিস্তারে এ বিদ্যালয়গুলোর নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিশ্রম কিছুতেই খাটো করে দেখার উপায় নেই। বিশেষ করে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বব্যাংকের শিক্ষাবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাংলাদেশে কর্মরত মিলিয়া আলী গত ১৭ অক্টোবর ১৯৯৭ ভোরের কাগজ-এর এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'মাধ্যমিক শিক্ষা ৯৭ শতাংশ বেসরকারি স্কুলের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়।' বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়া যে দেশের মাধ্যমিক শিক্ষার ভার শুধু অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বহন করা প্রায় অসম্ভব তা এ তথ্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যে বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো মাধ্যমিক শিক্ষাকে সচল রেখেছে সে বিদ্যালয়গুলোই আজ কোনো রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে। এ রুগ্ন বিদ্যালয়গুলো যে আমাদের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষানীতিরই ফসল—তা বোধ হয় আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

যেকোনো দেশেই শিক্ষাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার মূল দায়িত্ব সে দেশের সরকারের উপর বর্তায়। কিন্তু আমাদের মতো দরিদ্র দেশে একা সরকারের পক্ষে এ গুরুদায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। তাই সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি প্রচেষ্টায় দেশের অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এ পর্যন্ত গড়ে উঠেছে। কিন্তু এ বিদ্যালয়গুলোর অধিকাংশই আজ সরকারি বা মিশনারি বিদ্যালয়ের শিক্ষার মানের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছে না। বরং এ বিদ্যালয়গুলোকে শিক্ষার মানোন্নয়নের চেয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধ নকলের সুযোগ দেওয়া, ভুয়া শিক্ষক বা ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে বিদ্যালয়গুলোকে টিকিয়ে রাখা কিংবা রাজনীতি করে দলীয় শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া প্রভৃতি নানাবিধ দুর্নীতিতে অধিক মনোযোগী হতে দেখা যায়। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর এহেন বেহাল অবস্থা যেকোনো সচেতন অভিভাবককেই ভাবিয়ে তোলে।

কিন্তু বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো রুগ্নাবস্থায় একদিনে পতিত হয়নি। দেশের প্রচলিত বৈষম্যমূলক শিক্ষানীতির নানাবিধ ত্রুটি-বিচ্যুতির ফলেই যে এগুলো এমন দশায় উপনীত হয়েছে—তা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় আমাদের সম্মিলিতভাবে খুঁজে বের করতে হবে। বর্তমানে আমাদের দেশে সরকারি, বেসরকারি, মিশনারি বা স্বায়ত্তশাসিত প্রভৃতি সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের বিদ্যালয়গুলোর নীতিমালার মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে দেশে আজ এক ধরনের শিক্ষা সঙ্কট বিরাজ করছে। বেসরকারি বিদ্যালয়গুলোর জন্য প্রণীত সরকারি নীতিমালা অনেক বৈষম্যের সৃষ্টি করেছে। যেমন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার বৈষম্য। তাছাড়া বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোকে নানাবিধ কাজে যেমন বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি, শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ প্রাপ্তি কিংবা ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষার জন্য নাম রেজিস্ট্রেশন বা পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ওপর নির্ভরশীল থাকতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা তার মনোনীত প্রতিনিধিকে প্রায়ই ঘুষ প্রদানের বিনিময়ে এসব কাজ হাসিল করতে হয়। অন্যথায় এসব জরুরি কাজ আটকে রাখা হয়।

অপরদিকে বিদ্যালয়গুলোও সরকারি নীতিমালার ফাঁকফোকরে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার্থে অনেক সময় ভুয়া তথ্যাদি পরিবেশন করে থাকে। যেমন নির্দিষ্টসংখ্যক ছাত্রছাত্রী না থাকলে বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণাদি না থাকলে বিদ্যালয়কে সরকারি স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাই যেসব বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্রছাত্রী নেই বা প্রয়োজনীয় অন্য উপকরণাদি নেই, সেসব বিদ্যালয় ভুয়া ছাত্রছাত্রী দেখিয়ে বা কাগজ-কলমে ভুয়া শিক্ষা উপকরণাদি আছে দেখিয়ে নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানরূপে টিকে আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হাজিরা, পরীক্ষার ফলাফল বহি, ভর্তি রেজিস্ট্রারসহ ক্যাশবই পর্যন্ত ভুয়া তৈরি করা হয়ে থাকে। একজন ভুয়া ছাত্র বা ছাত্রী দেখানো মানেই অনেকগুলো খাতাপত্রে ভুয়া তথ্য লিপিবদ্ধ করা। এসব ভুয়া খাতাপত্রাদিই আবার সরকার কর্তৃক প্রেরিত অডিটরদের দ্বারা বৈধতা লাভ করে থাকে।

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বেসরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি বহাল রাখতে গিয়ে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা প্রভাবশালী মহলের অন্যায় আবেদন-নিবেদন মেনে চলতে বাধ্য করা হয়। যেমন নির্বাচনী পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রছাত্রীদের এসএসসি পরীক্ষায় অন্তর্ভুক্তির জন্য কিংবা ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রাপ্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য ভুয়া নম্বর প্রদান করতে হয়। বেসরকারি শিক্ষকদের যাতে কোনো অপশক্তির কাছে মাথা নত করে থাকতে না হয়, সেজন্য সর্বাগ্রে তাদের চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। পাশাপাশি সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সমান বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে বেতন বৈষম্য দূর করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে স্বজনপ্রীতি বা দলীয়করণ দূরীভূত করে প্রকৃত যোগ্য ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে সরকারি দায়িত্ব কমিয়ে আনার ফলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই অযোগ্য ও অশিক্ষিত ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি গঠন করতে হয়। কখনো কখনো সমাজবিরোধী ব্যক্তিরাও এসব পরিচালনা কমিটিতে ঢুকে পড়ে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষার মানোন্নয়নের চেয়ে নিজেদের ক্ষমতা প্রদর্শন, শিক্ষকদের ওপর মাতব্বরী কিংবা স্বাধীনচেতা শিক্ষকদের অযথা হয়রানি করা প্রভৃতি কার্যকলাপই প্রাধান্য পায়। কাজেই বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকারি দায়িত্ব পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে।

অধিকাংশ বেসরকারি বিদ্যালয়ের আয়ের প্রধান উৎস হলো ছাত্রবেতন। কাজেই এসব বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রী বাড়ানোর জন্য ন্যূনতম মেধা পরীক্ষা ছাড়াই ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়ে থাকে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে স্বাভাবিকভাবেই কম মেধার ছাত্রছাত্রীরা ভর্তির সুযোগ পেয়ে থাকে। তাই শিক্ষকদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলেও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হয় না। তাই বিদ্যালয়ে আয়ের উৎস হিসেবে ছাত্রবেতনের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে বিকল্প আয়ের উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

বেসরকারি বিদ্যালয়গুলো নিয়মিতভাবে পরিদর্শন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকারের স্থানীয় বা উচ্চ বিদ্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দের উদাসীনতা অনেক সময় এসব প্রতিষ্ঠানকে যদৃচ্ছভাবে চলতে সহায়তা করে। নিয়কি যদচ্ছমত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করতে হবে। অযোগ্য, নিষ্প্রয়োজনীয় বা নামসর্বস্ব বিদ্যালয়গুলোকে অপসারিত/সংযুক্ত বা প্রযোজনীয় সংস্কার সাধনের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

নিখিল রঞ্জন দাস : সিনিয়র শিক্ষক, বালাগঞ্জ ডি. এন. উচ্চ বিদ্যালয়, বালাগঞ্জ, সিলেট।

ভোরের কাগজ
20 APR 1998